সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বন্ধুত্ব

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

সুনীলের সঙ্গে আমার আলাপ 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার সূত্রে। কৃত্তিবাস সম্পাদনায় লক্ষ্য করেছি সুনীল একদিকে যেমন বন্ধুবৎসল, অন্যদিকে কোনো বন্ধু সম্পর্কে অতিরিক্ত দুর্বল। তারা কৃত্তিবাস পত্রিকায় অনেক প্রশ্রয় পেয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে উঠতে পারেনি। তাদের এই ত্রুটি, সুনীলের নয়। সুনীল আমেরিকা চলে যাওয়ার সময় (প্রথমবার) আমার উপর কৃত্তিবাস সম্পাদনার ভার দিয়ে গিয়েছিলো সম্ভবত এই কারণে যে আমার হাতে থাকলে কাগজটা বেরুবে। আমার চেয়ে যোগ্য কাউকে সে ভার দিলে হয়তো কাগজটা বেরুবেই না। এই নিয়ে সুনীলের অন্তরঙ্গ বন্ধুরা কেউ কেউ ক্ষুব্ধ হয়েছিলো। কিন্তু ওই যে বললাম, কোনো কোনো ব্যাপারে সুনীল একগুঁয়ে, কৃত্তিবাস সম্পাদনায় আমাকে সাময়িক দায়িত্ব দেয়ার ব্যাপারেও ওর এই দোষ বা গুণ দেখা গিয়েছিলো।

লেখালেখি ব্যাপারের বাইরে সুনীল সেই সময় ছিলো একটু অতিরিক্ত উদার। মানে সাধ্যের অতিরিক্ত উদার। পকেটে পয়সা থাকলে ফেরার ভাড়া না রেখেই খরচা করতো। নিজের খরচায় কৃত্তিবাস বের করার পর যখন কাগজ বিক্রির টাকা স্টল থেকে আদায় করে কেউ কেউ জমা দেয়নি সুনীল তাদের ক্রমাগত ক্ষমা করে এসেছে, এবং সেই সম্পর্কে কেউ কথাবার্তা বলতে চাইলে থামিয়ে দিয়েছে।

শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে এক মধ্যরাতের ঘটনায় এবং ধলভূমগড়ে অন্য এক মধ্যরাত্রের ঘটনায় সুনীল যে সাহস দেখিয়েছিলো, তাতে ও খুন হতে পারতো। শ্যামবাজারের মোড়ে এক অনিচ্ছুক ট্যাক্সি ড্রাইভারকে সুনীল থাপ্পড় মারে। সে দলবল নিয়ে ফিরে আসে, এবং আমাদের প্রচণ্ড প্রহার করে। আমি, সুনীল, উৎপল আর শক্তি ছিলাম। প্রহারের বেশির ভাগটাই আমার উপর পড়েছিলো। যার ফলে আমি এক তরকারির দোকানে শাকপাতার মধ্যে পড়ে যাই। একটু পরে এক দোকানি আমার চিবুকে রক্ত দেখে বোরোলীন নিয়ে শুশ্রূষা করতে আসে। হঠাৎ সুনীলের গর্জন শুনতে পাই, খবরদার, ওর গায়ে হাত দেবে না। শক্তিকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। পরে শোনা গেল ও ছুটতে গিয়ে কোনো বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং তারা ওকে থামের সঙ্গে বেঁধে 'চোর ' বলে খুব প্রহার করে। সেই রাত্রে আমরা উৎপলের রয়েড স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে ছিলাম। আমার মনে আছে, পরের দিন আবার সকাল সাড়ে নটায় রুটিনমাফিক অফিস করেছি। অফিসের মেডিকেল সেন্টারের নার্স ড্রেস করতে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কী করে কেটেছে? আমি বললাম, 'বাথরুমে পড়ে গিয়েছি।' সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঘা টা দেখে বলল, 'তুমি বাথরুমে পড়োনি, বাথরুম তোমার উপর পড়েছে।'

ধলভূমগড়ের ঘটনা সুনীল নিজেই লিখেছে 'অরণ্যের দিনরাত্রি' উপন্যাসে। সুনীলের সঙ্গে বন্ধুত্ব ক্ষুন্ন হয়নি কখনো, কিন্তু ক্রমশ আমাদের অন্তরঙ্গতার মধ্যে কিছু দূরত্ব এসেছে। দূরত্ব এসেছে, ক্রমশ যখন সুনীলের লেখা জনপ্রিয় হতে থাকলো, এবং নানা দিক থেকে ওকে টানতে লেগেছে। যতদিন কেউ আমাদের গ্রাহ্য করেনি, আমরা ভালো ছিলাম। এই সময় অর্থাৎ ১৯৬৭ সালে আমরা দিল্লী চলে যাই। খানিকটা বিরক্ত হয়েই। সুনীল চিঠি লিখে জানালো ওর 'প্রতিদ্বন্দ্বী' উপন্যাস সত্যজিৎবাবু চলচ্চিত্রায়িত করছেন। কিছুদিন পর আবার লেখে ওর 'অরণ্যের দিনরাত্রি' সত্যজিৎ রায় ছবি করছেন। এবং ওর খুব লজ্জা করছে।

আমাদের মধ্যরাত্রি ভ্রমণে একটা খুব প্রিয় জায়গা ছিলো নিমতলা শ্মশান। সন্ধেরাত্রির সব দৌরাত্ম্য সাঙ্গ হলে আমরা শ্মশানে গিয়ে বিশ্রাম করতাম। গাঁজা খেতাম এবং অপেক্ষমান মৃতদেহগুলোর সঙ্গে কথাবার্তা বলতাম। নেশায় চোখে চিতার হল্কা আর পোড়া মাংসের গন্ধ অত্যন্ত আরামদায়ক মনে হতো। একবার ছুটিতে কলকাতায় এসে এইরকম এক মধ্যরাত্রে নিমতলায় যাবার প্রস্তাব করলাম, সুনীল রাজি হলো না। আমি বললাম, 'এখন শ্মশান না ছুঁয়ে বাড়ি যাওয়া অসম্ভব।' সুনীল জোর করে আমায় বাড়ি পৌঁছে দিল, হাত ছাড়িয়ে চলে গেল। বলে গেল, 'এখন সে সব দিন আর নেই।' বুঝলাম, আসলে আমিই সেই ১৯৬৫-৬৬ সালে পড়ে আছি, সুনীল এগিয়ে গেছে বা সরে গেছে।

ও আমেরিকা থেকে ফিরে (প্রথমবারের যাওয়ার কথাই বলছি, কেননা এই যাওয়াটা কোনো যাওয়াই নয়) আবার কৃত্তিবাসের হাল ধরলো, 'যুবক যুবতীরা' বলে একটা উপন্যাস লিখলো। 'সোনালী দুঃখ' নামে একটা প্রেমকাহিনী ছাপা হলো তখন। ওর একটা সরকারি চাকরি ছিলো, দীর্ঘদিন অনুপস্থিতির ফলে সেটা গেছে। আনন্দবাজার পত্রিকায় একটা সাপ্তাহিক কলম লেখে, সামান্যই আয়। সেই সময় আমি এক বিদেশী ফার্মে চাকরি করি। আমাদের অফিসে পাবলিক রিলেশনস্ অফিসারের একটি পদ খালি হলো। হাজার টাকার উপর মাইনে। একটা হাউস ম্যাগাজিন সম্পাদনা করা, আর কিছু সংবাদপত্রের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, এই কাজ। সুনীলকে দরখাস্ত করতে বললুম। ও ইন্টারভ্যু পেলো। ইন্টারভ্যু-এর দিন হঠাৎ ওর টেলিফোন। 'চাংওয়া থেকে বলছি, এক্ষুনি দেখা হওয়া দরকার।' জিজ্ঞেস করলাম 'ইন্টারভ্যু?' বলল, 'তারপর যাবো।' দেখা হলে বলল, 'ইন্টারভ্যু দিলে যদি চাকরিটা হয়ে যায় অর্থাৎ তাহলে চিরকাল পাবলিক রিলেশনস্ অফিসার হয়েই থাকবো?' আমি বিরক্ত হয়েছিলাম। কিন্তু পরে বুঝেছি, সুনীল তখন থেকেই বড় করে কিছু করার কথা ভাবছিল। আজকে সে কী লিখছে, কেমন লিখছে এসব প্রশ্ন অন্যেরা করুক। আমি বলবো সুনীল লেখা ছাড়া আর কিছু করেনি, এবং তা পেরেছে ঠিক সময় ঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিল বলে। অনেকেই ঠিক সময় প্রলোভনের সামনে পড়লে না বলতে পারে না। সুনীল না বলেছে।

আজকে ওর পরিচয়ের জগৎ অনেক বড়। আমরা একসময়ের বন্ধুবান্ধব আশেপাশে আছি। মাঝেমধ্যে দেখা হয়। পুরনো দিনের কথাবার্তা প্রায়ই হয় না। তবু এই দেখা হওয়াই যথেষ্ট। এই বয়সে নতুন করে বন্ধুত্ব করা আর সম্ভব নয়। আমার একমাত্র কামনা প্রচণ্ড অনিয়ম সত্ত্বেও সুনীলের অটুট স্বাস্থ্য ওকে দীর্ঘজীবি করুক।